বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.010

অজয় ভট্টাচার্যের *বাতাসীর মা* : নিপীড়িত শ্রেণির প্রতিরোধ ও সংগ্রামের বয়ান

মো. রাব্বি ইসলাম রাসেল*

সারসংক্ষেপ

অজয় ভট্টাচার্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক স্বল্পালোচিত লেখক। তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসেবে সাহিত্য সাধনা করেছেন এবং আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় সংগ্রামী, মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র উপস্থাপন করেছেন। সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অজয় ভট্টাচার্য মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে বাংলার শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের সংগ্রাম ও টিকে থাকার লড়াইকে সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। নিজের শ্রেণি-রাজনীতি বিষয়ে ছিলেন দ্বিধাহীন, অবিচল এবং মার্কসবাদপ্রসূত শ্রেণি-রাজনীতি তথা সাম্যবাদী রাজনীতি ছিল তাঁর আমৃত্যু কর্মক্ষেত্র। তিনি বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের নানকার, চা-শ্রমিকসহ গণমানুষের রাজনীতি ও জীবনযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতা, ইতিহাসকার ও শিল্পভাষ্যকার। তাঁর সাহিত্যকর্মের শিল্পমূল্য নিয়ে অনেকের জিজ্ঞাসা থাকলেও জীবনে ও সাহিত্যে দ্বিধাহীন সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ প্রশ্নাতীত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মার্কসীয় তাত্ত্বিক মতবাদের আলোকে তাঁর অবদান এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনভাষ্য হিসেবে *বাতাসীর মা* উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অজয় ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর সাহিত্য নিছক শিল্প নয়– বরং সমাজবাস্তবতার দলিল, যেখানে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণি-সংগ্রামই মূল বক্তব্য।

চাবি শব্দ: অজয় ভট্টাচার্য, বাতাসীর মা, শ্রমজীবী মানুষ, কার্ল মার্কস, শ্রেণি-সংগ্রাম।

এক

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), যিনি সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব রেখেছেন। তাঁর মতে, মানব সমাজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এক ধারাবাহিক শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি বলেন, 'The history of all hitherto existing society is the history of class struggles'.[১] যতদিন সমাজে উৎপাদনের উপকরণ অসমভাবে বণ্টিত থাকবে, ততদিন সমাজে এক শ্রেণি অন্য শ্রেণিকে শোষণ করবে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ চলমান থাকবে। মার্কসের শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্বের ভিত্তি তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) ধারণায় নিহিত। এই মতে সমাজের বিকাশ বা পরিবর্তন চিন্তা, নৈতিকতা বা ধর্ম দ্বারা নয়, বরং অর্থনৈতিক ভিত্তি (Economic basis) বা উৎপাদন ব্যবস্থার ধরন দ্বারা নির্ধারিত হয়। মার্কস বলেন — 'It is not the consciousness of men that determines their being, but their social being that determines their consciousness.'[২] সমাজে মানুষ

* সহকারী অধ্যাপক, সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে যে স্তরে বিভক্ত, তাকেই শ্রেণি বলা হয়। কার্ল মার্কসের মতে, শ্রেণি নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা দ্বারা, সমাজে মানুষ সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে যে স্তরে বিভক্ত, তাকেই শ্রেণি বলা হয়। যারা জমি, কারখানা ও পুঁজির মালিক তারা শাসক শ্রেণি (বুর্জোয়া), আর যারা কেবল নিজেদের শ্রম বিক্রি করে বেঁচে থাকে তারা শ্রমিক শ্রেণি বা সর্বহারা। এই দুই শ্রেণির স্বার্থের দ্বন্দ্বই শ্রেণি-সংগ্রামের জন্ম দেয়। ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) শ্রেণিকে কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা – এই তিনটি মাত্রায় বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক সমাজে সাধারণত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত – এই তিনটি প্রধান শ্রেণি দেখা যায়। যতদিন সম্পদ ও ক্ষমতার অসম বণ্টন থাকবে, ততদিন শ্রেণির প্রশ্নটি সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে। এভাবে এক শ্রেণি অন্য শ্রেণিকে শ্রম ও মজুরির ব্যবধানের মাধ্যমে শোষণ করে। কার্ল মার্কস সমাজের বিকাশকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে বিভাজন করেছেন, যেখানে প্রতিটি পর্যায়েই শ্রেণি-সংগ্রাম বিদ্যমান। মার্কস বিশ্বাস করেন, 'শ্রমিক শ্রেণি এক সময় তাদের শোষণের প্রকৃতি বুঝতে পারবে এবং তারা নিজেদের একত্রিত করে বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করবে'। এই সচেতনতা অর্জনের প্রক্রিয়াই হলো শ্রেণি-চেতনা (Class Consciousness)। মার্কস উল্লেখ করেন, 'যখন শ্রেণি-সংঘর্ষ তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে, তখন শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লব ঘটাবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat), এবং শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠবে একটি শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত, সাম্যবাদী সমাজ। এই নতুন সমাজে উৎপাদনের উপকরণ থাকবে সমষ্টিগত মালিকানায়, প্রত্যেকে কাজ করবে ক্ষমতা অনুযায়ী, আর পাবে প্রয়োজন অনুযায়ী'। তাঁর মতে, 'Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman—in a word, oppressor and oppressed—stood in constant opposition to one another'[৩] মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী সমাজ বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্ব বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক; ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও শ্রমিক অধিকার আন্দোলন, সামাজিক ন্যায় ও সমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য সবক্ষেত্রেই শ্রেণি-সংগ্রামের প্রতিফলন দেখা যায়। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক চিন্তায় মার্কসের এই তত্ত্ব এখনও একটি মৌলিক দর্শন ও সামাজিক ব্যাখ্যা কাঠামো। তিনি উপলব্ধি করেন সামাজিক সংকটের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা। কাজেই সমাজ বিপ্লবের জন্য অর্থনীতির মৌলিক প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করার প্রয়োজন রয়েছে।[৪]

সামাজিক জীবন ও সমসময়কে উপেক্ষা করে কোনো শিল্পী বা লেখকের সৃষ্টিকর্মের পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর নয়। চোখে দেখা সমাজ ও সামাজিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের নানা সংকট ও সামাজিক ঘটনা দ্বারা মহৎ শিল্পীর হৃদয়ে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তা থেকেই সৃষ্টি লাভ করে মহৎ সাহিত্য, শিল্পকর্ম, স্থাপত্য বা কলা এবং যার সকল উৎস হলো শিল্পীর মানসভূমি ও বাস্তব জীবন। বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির একটি বড় আশ্রয়, বিশেষ করে মহৎ সাহিত্যের একটা লক্ষণ হিসেবে একে বিবেচনা করা যায়। চোখে দেখা মানুষের সংগ্রাম-সাফল্য, দুঃখ-বেদনা সহিত্যে রূপায়িত হোক, মার্কসবাদীরা সেটা কামনা করে না। বরং বাস্তবজীবন ছেড়ে কল্পজগতে ডুব দেওয়া গৌরবের ব্যাপার নয়।[৫] সাম্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শকে লালন করে শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে উপজীব্য

করে পূর্ববাংলায় যে সমস্ত কথাসাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা অজয় ভট্টাচার্য (১৯১৪-১৯৯৯) অন্যতম। তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে এদেশের নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠীর জীবনের বিচিত্র কাহিনি, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের করুণ প্রতিচ্ছবি। তিনি জীবনের সূচনালগ্ন থেকে সাম্যবাদ ও শ্রেণিশোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন এবং এরই লক্ষ্যে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। সামন্ত-শাসিত সিলেটের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত, নিম্নবর্গের জীবন তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছে এবং তাঁদের জীবনকে সাহিত্যে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসেবে সাহিত্যচর্চা করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা বস্তুবাদী জীবনপ্রসূত সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী। শ্রেণিহীন সমাজ রাষ্ট্র বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সাহিত্যচর্চা ছিল অজয় ভট্টাচার্যের জীবন ও সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য। এজন্য তাঁর কথাসাহিত্যে দেখা যায় ইতিহাস, রাজনীতি, সমকালের সেতুবন্ধন। এসব সাধারণ অন্ত্যজ, সর্বহারা মানুষের জীবনের আলোকেই তিনি দেখিয়েছেন মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা ও সংকট। অভূতপূর্ব এক জীবনবোধের মধ্য দিয়ে তিনি উন্মোচন করতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব, বেদনা ও যন্ত্রণার জগৎ। তিনি *বাতাসীর মা* (১৯৮৫) উপন্যাসে নানা প্রতীক ও চিত্র ব্যবহার করে শ্রমিক শ্রেণির রক্তাক্ত নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনকে উপস্থাপন করেছেন।

দুই

পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যজ্যবাদের শৃঙ্খলমুক্তির মতবাদ মার্কসবাদ-লেলিনবাদের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ভারতবর্ষে। বস্তুত সময় ও সমাজ সচেতন লেখক অজয় ভট্টাচার্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক প্রভাবের ইতিবাচক সৃষ্টি। বিশ্বসাহিত্যে নিকোলাই অস্ত্রভস্কি ও ম্যাক্সিম গোর্কির সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ কিংবা মায়াকোভস্কির ফিউচারিজম ও বিপ্লবী ধারার সাহিত্যের ন্যায় অজয় ভট্টাচার্য এদেশে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপকার এবং তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। মার্কসবাদের সৃজনশীল জাদুর ছোঁয়ায় কবি, লেখক, শিল্পী-সাহিত্যিকের মন ও মননে চিন্তা-চেতনায় যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয় তার প্রকাশ ঘটেছে অজয় ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্মে। ১৯৩৭ সাল থেকে সাহিত্যচর্চাকে তিনি তাঁর সংগ্রামী কাজের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ আমলে সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে জ্যোতির্ময় নন্দীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো সাপ্তাহিক 'নয়া দুনিয়া' ও 'সংহতি' পত্রিকা এবং কালীপ্রসন্ন দাস সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বলাকা'। এই সমস্ত পত্রিকার মাধ্যমে লেখক হিসেবে অজয় ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ হলেও দীর্ঘ কারাজীবন (১৯৪৭-১৯৬৭) ছিল তাঁর লেখক জীবনের মূল পর্যায়।[৬] তাই বলা যায়, অজয় ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক 'নানকার বিদ্রোহে'র (১৯৪৭-১৯৫০) নেতৃত্ব প্রদান, কারাভোগ, আমৃত্যু রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকা, রাজনীতির পরিপূরক হিসেবে সাহিত্য সাধনা, সমস্ত কিছু তাঁর সাম্যবাদী মার্কসীয় রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বাসের পরিপূরক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের দীর্ঘ কারাজীবনে তিনি দেশের নানা কারাগারে

অসংখ্য বিপ্লবী সাহিত্যিক ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পান। এসব বিপ্লবী সাহিত্যিক ও ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪), চারু মজুমদার (১৯১৯-১৯৭২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কারান্তরীণ থাকাকালীন তিনি সাহিত্যকর্ম রচনার মাধ্যমে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন এবং সহবন্দিদের সাহিত্য সাধনা অজয় ভট্টাচার্যকে সাহিত্য রচনায় অধিক উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত করেছে।

'মানুষের জীবনযাপনের নানা উপকরণ ও উপায় প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন উপকরণ ও উপায় তৈরি হচ্ছে। এই নতুন উপকরণ ও উপায় গল্প – উপন্যাসের শরীর গঠন করে'।[৭] উপন্যাসে মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয় রূপায়িত হয়। 'উপন্যাসের কাছ থেকে আমরা জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান চাই। সমাজ এবং সমাজ-বিধৃত মানুষ, পট এবং পট-নির্ভর জীবন উপন্যাসের উপাদান।'[৮] সমাজের 'ভিত্তি' ও 'উপরিকাঠামো' দুটোই বস্তুনিষ্ঠভাবে অজয় ভট্টাচার্যের সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। শ্রেণিসংগ্রাম এই 'ভিত্তি' ও 'উপরিকাঠামো'র মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নেয়। কার্ল মার্কসের ভাষায়–

> In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations... . The mode of production of material life conditions the general process of social, political, and intellectual life.[৯]

শ্রেণিসংগ্রাম এই ভিত্তি ও উপরি কাঠামোর মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম এবং শ্রেণি সংগ্রামের দ্বারা সর্বদা সমাজ এক অসম দ্বন্দ্বে লিপ্ত, যা বস্তুবাদী সাহিত্যের এক সাধারণ বিষয়বস্তু। বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী লেখকগণ সার্থকভাবে শ্রেণিসংগ্রামের এই চিত্র উপস্থাপন করেছেন যা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন শিল্পীর দায়িত্ব এবং তাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। 'মার্কসের অনুসারীরা শিল্পীর কাছে আশা করেন দৃঢ় ভূমিকা। শিল্পী অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি বিধায় তিনি মানুষের দুঃখে বিচলিত হবেন। তিনি মানুষের দুঃখ মোচনের সংগ্রামে এগিয়ে যাবেন।'[১০] অজয় ভট্টাচার্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসেবে সাহিত্য রচনা করেছেন এজন্য শিল্পের মানদণ্ড বিচারে তাঁর উপন্যাস অনেক সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ; যা তাঁর শিল্পীসত্তাকে করেছে বিচার্য বা বিবেচনার অংশ। অজয় ভট্টাচার্যের স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপটে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *বাতাসীর মা*। 'প্রচলিত অর্থে এটি রাজনীতিমুখ্য উপন্যাস নয়, এমনকি রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক কোন তৎপরতা আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষযোগ্য নয়।'[১১] ক্ষুদ্র ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজপীড়িত গ্রাম্যজীবনে 'নানকার' শ্রেণির মানুষের জীবন আলেখ্য বিবেচনা করা হয় *বাতাসী মা* উপন্যাসকে। 'নান' অর্থ রুটি এবং 'নান' শব্দ থেকেই 'নানকার' শব্দের উদ্ভব। নান বা রুটির বিনিময়ে শ্রমিকেরা কাজ করতে বাধ্য থাকত এবং পরবর্তীতে এই প্রথা 'নানকান প্রথা' নামে পরিচিত হয়।[১২] উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে চা শিল্পের বিকাশ ঘটে কিন্তু চা বাগানের কাজের জন্য স্বল্প বা নামমাত্র মুজুরি দিয়ে শ্রমিক পাওয়া এদেশে সম্ভব ছিল না, তাই উত্তর ভারত ও মধ্য প্রদেশ থেকে নানা মিথ্যা লোভ ও প্রলোভন দেখিয়ে অসংখ্য শ্রমিক ও মজুর নিয়ে এসেছিল ব্রিটিশরা। যাদের স্বল্প মজুরি বা নান দিয়ে কাজ করাতে জোর বা বাধ্য করা হতো এবং এদেশের ইতিহাসে তারা নানকার বলে পরিচিত। ভূমিদাসদের

জীবন-যন্ত্রণা ও তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন প্রত্যয়দীপ্ত প্রতিরোধের চেতনাসঞ্চারী উপন্যাস *বাতাসীর মা*। এ উপন্যাসে বসন্তপুর গ্রামের সমাজচিত্রের মধ্যদিয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সিলেট অঞ্চলের সামন্ত সমাজকাঠামো এবং এর রূপ-রূপান্তরের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি থেকে জানা যায় বসন্তপুরের গ্রামীণ সমাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত 'মোসুরি তালুকে'র ওপর প্রতিষ্ঠিত। তালুকের মালিক 'বড়বাড়ি'কে কেন্দ্র করে উপগ্রহের মতো আবর্তিত হয় পুরো গ্রাম। *বাতাসীর মা* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বাতাসীর মার দৃষ্টিও ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বড়বাড়ির দিকে স্থির হয়ে থাকে। সমগ্র গ্রাম বড়বাড়িকে মান্য করে চলে, বড়বাড়ির আদেশ নির্দেশে সমগ্র গ্রামের মানুষ ওঠে-বসে। এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার সকল পথ বন্ধ। বসন্তপুর গ্রামের মানুষের এ অবরুদ্ধ অবস্থা সম্পর্কে অজয় ভট্টাচার্য বর্ণনা করেছেন-

> যাবার কারো আর পথ নেই। বড় বাড়ির ভূমিতে তারা বাস করে, বড়-বাড়ির জমিতে চাষ করে, বড়-বাড়ির ভিটা পুড়ে সারা জীবনই তাদের ভাত রেধে খেতে হয়। যাবার পথ তাই রুদ্ধ। তাই তারা ঘোরে, বড়-বাড়িকে কেন্দ্র করে সারা জীবন কেবল ঘুরে ঘুরে ফেরে। তারা ছোটে, বড়-বাড়ির হাঁকে-ডাকে সারা জীবনই তাদের ছুটে বেড়াতে হয়।[১৩]

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ধারণ করা মার্কসীয় সমালোচনা শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।[১৪] তাই বাতাসীর মার ন্যায় নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও কাহিনি আবর্তিত হয়েছে, যা ছিল ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবনার আত্মপ্রকাশ।

তিন

বাতাসীর মা উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের শাসক চরিত্রের নানা কদর্যরূপ ও বিষয়কে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। বড়বাড়ির বড়বাবু, মেজোবাবু, ছোটবাবুরা প্রজাদের তথা নানকার ও বেগার (যৎ সামান্য টাকা বা খাবারের বিনিময়ে কাজ আবার কখনো বিনা পারিশ্রমিকে কাজ) শ্রেণির ওপর নানা বর্বর ও অমানবিক আচরণ করত। সামন্তসমাজে লাম্পট্য সর্বব্যাপ্ত রূপ লাভ করে এবং সমাজজীবনে তার নানামুখী প্রকাশ ঘটে। বসন্তপুর গ্রামে কোন বাদীর বিবাহ সম্পন্ন হতে পারত না, কারণ সামন্তপ্রভুরা গ্রামের দরিদ্র সেবাদাসীদের নিজেদের সম্ভোগের একচ্ছত্র সামগ্রী বলে মনে করত এবং তাই তাদের বিয়ে হতো কেবল নামমাত্র বিয়ে, যা দাসী বিয়ে নামে পরিচিত ছিল এবং স্বামীর ঘর তারা কোনোদিনই করতে পারত না। উপন্যাসে দেখা যায় বড়বাড়ির ছোটবাবু তাদের বাড়ির দাসী রঙমতীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে। দুলাল রঙমতীকে এ জীবন থেকে উদ্ধার করে শহরে রেখে আসে যা ছিল দুলালের মানবিক কোমল হৃদয় ও বোধের বহিঃপ্রকাশ। বাতাসীর মা এবং দুলালের সংলাপের মধ্য দিয়ে দাসীদের বৈবাহিক জীবনচিত্র এখানে রূপায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন দাসীদের বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংলাপ উপস্থাপিত হয়েছে :

> 'বড় বাড়ির বাঁদীর কি বিয়ে হয় না?'
> 'হয়, হয়, খুব হয়। কিন্তু তা ঐ বাঁদী-বিয়ে।'
> 'বাঁদী বাঁদীই থাকে, আর বিয়েটা হয় কেবল নামেই।'
> 'তা ত জানি। বাঁদীকে বিয়ে করতে হলে ত'
> 'বাঁদী-বিয়েই করতে হয়।'

'কিন্তু তা আমি করতে চাইনি।'

'তবে কী তুমি চেয়েছিলে?'

'চেয়েছিলাম বড়-বাড়ি থেকে তাকে বের করে আনতে। কিন্তু ছোটবাবু সেখানে বাধা রঙমতীকে হাতছাড়া করতে কিছুতেই তিনি রাজি নন।'[১৫]

সামন্ত প্রভুরা নিজেদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের অংশ হিসেবে এসব বাদীকে ভোগ করেছে। দুলাল সামন্ত-প্রভুদের এই কদর্যরূপ ও জীবন-যাপন রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এবং বড়বাড়ির কর্তাদের রোষানলে পতিত হয়েছে। তবে দুলালের বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে একটি নতুন ও আশাবাদী সমাজের স্বপ্ন বুনেছেন লেখক।

বসন্তপুরের সামাজিক রীতি অনুসারে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন পঞ্চায়েতি বিলে মাছ শিকার করা হয় এবং বড়বাড়ির কর্তাদেরকে ধৃত মাছের একটি অংশ প্রদান করতে প্রত্যেক প্রজা বাধ্য থাকে। জমিদারের খাস তালুকে বাস করে ভাগ না দিয়ে কোনো উপায় থাকে না। জমিদারের জন্য খাজনার পাশাপাশি নানারকম সেলামি প্রদানের বৈশিষ্ট্য সামন্তসমাজে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। জলে বসে যেমন কুমিরের সাথে বিবাদ করা অসম্ভব, তেমনি জমিদারের তালুকে বাস করে জমিদারের বিরুদ্ধে কথা বলাও চলে না। সেজন্য বড়বাড়ির সাথে দুলালের বিরোধে বাতাসীর মা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে তবুও সে দুলালকে বড়বাড়ির সামন্ত প্রভুদের কথা শুনে চলতে বলেছে কিন্তু দুলাল কোনো কথা শোনেনি। দুলাল কোনো এক ঘটনার কারণে বড়বাবুর দ্বারা প্রহৃত হয়েছিল যা সে কখনো ভুলতে পারেনি।

নানকার অধ্যুষিত সিলেট অঞ্চলের সামন্ত সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বেগার শ্রমদানে বাধ্য ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে জমিদারকে কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক হলেও, কায়িক শ্রমদান বাধ্যতামূলক ছিল না। জমিদারি প্রথা অনুসারে কর প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রজাদের জমিদার শারীরিকভাবে নিপীড়ন করত, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত, এমনকি নারীদের লাঞ্ছিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। জমিদার অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য জমি কেড়ে নিত এবং তাদেরকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হতো। জমিদারি শোষণের এরূপ নগ্নরূপ প্রকাশ পায় বড়বাড়ি কর্তৃক জব্বার, রসিক, মুর্শেদ, রমেনকে সর্বস্বান্ত করে ভিটেছাড়া করার মধ্য দিয়ে। যদিও এ সমাজের মধ্য থেকে জন্ম হয় 'সব দুষ্ট কীট' যারা পরবর্তীকালের নতুন বিপ্লবী শক্তি। শ্রমজীবী, অত্যাচারিত, শোষিত, নিঃস্বশ্রেণির প্রতিনিধি জব্বার, রসিক, মুর্শেদ, রমেন দেশত্যাগী হয়ে আসাম চলে যায় এবং নিজেদের ভাগ্যের উন্নতি ঘটায়। উল্লেখযোগ্য যে, নিপীড়িত নানকারদের দেশত্যাগের বাস্তবতা ক্ষুদ্র জমিদারশাসিত সিলেট অঞ্চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। দুলালও জমিদারের শাসন নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য দেশত্যাগ করতে চেয়েছিল, আর সেজন্য বাতাসীর মাকে রেখে আসাম গিয়েছিল প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে কিন্তু সে আসাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে পায়ে গভীর ক্ষত নিয়ে; যা ছিল তার মৃত্যুর কারণ।

চার

আলোচ্য উপন্যাসে সামন্ত প্রভুদের শাসনের চিত্র উপস্থাপিত হলেও এখানে কিছু মানবিক বিষয়ের উপস্থাপন রয়েছে। এ উপন্যাসে বঙ্কিমবাবু বিবেকবান মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি গ্রাম্য

ডাক্তার হিসেবে বসন্তপুর গ্রামের অসহায় মানুষদের চিকিৎসা করেছেন কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি সবার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেননি। তিনি সমস্ত গ্রামের মানুষের মঙ্গল কামনা করেছেন এবং গ্রামীণ দরিদ্র প্রজাদের সাহায্যে তিনি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেছেন অনেক সময়। তার মানবিকতা সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক বলেছেন : 'আর বাতাসীর মা জাতীয় লোকগুলোর ব্যাপারে ত কথাই নেই। এমন উপায়ান্তরহীন মানব গোষ্ঠীকে যমের সাথে পাঞ্জা লড়তে হাতের পয়সা খরচ করেও সাহায্য করতে কোনদিন তাকে কুণ্ঠিত হতে দেখা যায়নি।'[১৬] ডাক্তার বঙ্কিমবাবু জমিদারদের অত্যাচার ও নির্যাতন দেখে দুঃখিত হলেও কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি করতে পারেননি। স্বামী দুলালের মৃত্যুর পর বাতাসীর মা অকূল সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। বীরু এবং বাতাসীকে বাঁচাতে সে টিকে থাকার প্রতিকূল পরিবেশে প্রাণপণ লড়াই করেছে। বাতাসীর মার জীবন সংগ্রাম দেখে অনেকে তাকে অন্যের ঘরে আশ্রয় নিতে অর্থাৎ বিয়ের কথা বলেছে কিন্তু সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা থেকে বিরত থেকেছে। যা তাকে আবহমান ভারতীয় নারীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছে, কারণ ভারতীয় নারীর নিকট স্বামীর মৃত্যু মানেই আবার নতুন করে জীবন শুরু করা নয়, স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকারও ব্রত। ঐতিহ্য অনুসারেই বাঙালি সমাজে নারীর অস্তিত্ব পুরুষসাপেক্ষ। পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া বাঙালি নারীকে রূপময় করা সম্ভব হয় না। বাঙালি নারীর জীবনে পুরুষের প্রভাব নিয়তির মতোই গভীর। ভারতীয় শাস্ত্রে পুরুষের সর্বময় কর্তৃত্বের আওতায় নারী এক জৈবযন্ত্র; পাতিব্রত্যে, সতীত্বে আর মাতৃত্বে নারীর নারীত্ব প্রস্ফুটিত হয়। ভারতীয় 'নারীর সুপরিচিত মোহময় এক বন্ধনের নাম সংসার–স্বামী-সন্তানের দেখাশুনা।'[১৭] তাই স্বামীর মৃত্যুর পরে এক অসম ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়েছে নিজের পরিবার ও সতীত্ব রক্ষার জন্য। বড়বাড়ির স্ত্রীরা নিজেদের ভেবেছে সর্বেসর্বা; সতীত্ব ও পবিত্রতা শুধু বড়বাড়ির স্ত্রীলোকের জন্য। বেগারদের জীবনে সতীপনা তারা সহ্য করতে পারে না। বাতাসীর মাকে দেখে বড় গিন্নী নিজের মনের সঞ্চিত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সে বাতাসীর মাকে বলেছে, 'এত দিনে সতীপনা তোর গেল?' বড় গিন্নীর মনে বাতাসীর মাকে দেখে যে ক্ষোভের উদ্রেক হয় ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের আলোকে তা উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> বাতাসীর মার সতীপনায় গিন্নীদের ক্ষোভ। বেগার বধূর আবার সতীপনা কী? বাবুদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে দুলাল যেদিন তার বউকে বড় বাড়িতে খাটতে দিতে অস্বীকার করে বসল সেদিন থেকে বড় বাড়ির গিন্নীরা বাতাসীর মাকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই ধরে রেখেছিলেন। এ গ্রামে সকল সময়ের একচ্ছত্র মালিক যারা, সতীত্বের একমাত্র দাবিদার তারা হবে না কেন? অপরের এ দাবি কেবল বড়বাড়ির গিন্নীদের অবমাননা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। ক্ষোভ তাদের এখানেই। প্রথম কথায় বড়-গিন্নী এ ক্ষোভই ঝাড়লেন।[১৮]

নানাভাবে বাতাসীর মাকে অপমান করে বড়গিন্নী কাজ দেয় তবে বড়গিন্নী পারিশ্রমিক হিসেবে বলেছে, 'কাজ যা করবি তার অর্ধেকটা কিন্তু বেগারী, আর বাকি অর্ধেকের তুই মাইনে পাবি।' বাতাসীর মা সন্তানদের জীবন বাঁচাতে এবং অস্তিত্বের সংগ্রামে এই অযৌক্তিক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই নিদারুণ দারিদ্র্য, অমানবিক শোষণ, নির্মম শ্রমদান এবং কার্যকর চিকিৎসার অভাবে বাতাসীর মতো বালিকাদের অকালমৃত্যু ঘটে। বাতাসীর মৃত্যু বিধবা বেগার জননীকে শোকস্তব্ধ করলেও ক্ষুধার তাড়নায় কয়েকদিন পরেই নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজের

খোঁজে বিভিন্ন বাড়িতে যেতে হয়। বাতাসীর মার দুর্দশা দেখে গ্রামের মানুষ তাকে কাজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে বড়বাড়ির গিন্নিরা বলেছেন :

> বড়-গিন্নী বলেন, 'কাজের লোক ত আমি রেখেই দিয়েছি। তবে কেবল খাই-খোরাকী কাজ করতে চাইলে কথাটা নয় ভেবে দেখব।' মেজো-গিন্নী বলেন, 'তা নিত্যি কাজে অত লোক লাগবে কেন? তবে হ্যাঁ, বাড়তি কাজ কোন দিন এসে পড়লে বাতাসীর মা কথাটা নয় ভেবে দেখব। কিন্তু তা অই পেটে-ভাতেই।' ছোট-গিন্নী বলেন, 'বাতাসীর মাকে নিয়ে কোন কাজই হবার নয়। বলা নেই, কহা নেই, একটা ছুতো পেলেই কাজ কামাই করা তার স্বভাব। তার চেয়ে অন্য কোথাও গিয়ে সে কাজ দেখুক।'[১৯]

বড়বাড়ির ক্ষমতার দাপট তাদের পাইক-পেয়াদা এমনকি তাদের ভৃত্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বলে তারাও নিজেদের বিশেষ ক্ষমতাবান বলে মনে করেছে। তারা মালিকের পক্ষ নিয়ে বেগার প্রজাদের গায়ে হাত তুলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কোনো বেগার অবাধ্য হলে তাকে জোর করে বড় বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। বড়গিন্নি সামান্যতম অপরাধে বেগার নারীদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি প্রদান করে। জমিদার বাড়ির অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার জন্যই রমেন, জব্বার, রসিক, মুর্শেদের মতো বেগারদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসামে চলে যেতে হয়। বড় গিন্নির মতো নারীরা বেগার নারীদের বিশ্বাস করে না, তাই বড়বাড়ির কাজের লোক ঝট্‌কাকে মশলা গুড়া করা শেষে নারীদের দেহ তল্লাসি করতে দিয়েছে। ঝট্‌কা তার পাশবিকতা মেটানোর জন্য অল্প বয়সি মেয়ে পুটির কাপড়ের ভাঁজ দেখার ছলে শরীরে হাত দিয়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় : 'পুটির গাল থেকে সে হাত সরিয়ে নিল। দেখি তোর কাপড়ের ভাঁজটা দেখি, বলতে বলতে কাপড়ের ভাঁজ দেখবার ছলে বুকের আঁচল আলগা করে কিশোরী পুটির ঈষদুন্নত বুকটা সে দু'হাতে খামচে ধরল।'[২০]

গ্রাম্য মধ্যবিত্তের সামান্য আর্থিক উন্নতি ঈর্ষাকাতর করে তোলে বড়বাড়ির গিন্নিদের। যদিও এসব উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থান বড়বাড়ির থেকে অনেক পিছিয়ে তবুও এসব মধ্যবিত্ত সর্বদা বড়বাড়ির সঙ্গে অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের সাথে জমিদার পরিবারের সদস্যদের সামাজিক-মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহতভাবে বিরাজমান থাকে। ইংরেজ প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সামান্য পদে চাকরি করাকে গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষ সম্মানের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু 'মার্চেন্ট অফিসে'র চাকরিকে গ্রাম্য জমিদারেরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাদের মতে এগুলো সাহেবদের 'কুত্তার রাখালি' কিংবা মেম সাহেবদের 'গৃহভৃত্যের' সমপর্যায়ের কাজ। গ্রামের গর্বিত মা তার ধর্মীয় বিশ্বাসে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পুত্রের জন্য পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করে। চাকরিজীবী পুত্রের জন্য এসব নারী সুপ্ত অহমিকা প্রকাশে দ্বিধা করেন না। এ সমাজে গ্রাম্য বেগাররা পূজা অর্চনা নয়, সামান্য প্রভুদের খুশি রাখার চেষ্টা করে; বেগাররা বুঝতেও পারে না বিলেতি কিংবা স্বদেশি মালিকের মধ্যকার প্রভেদ কোথায়? ক্ষুদ্র জমিদার বিষয়ে গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাদের পরাজয় কামনা করেছে। তবে এসব মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষর জমিদার শ্রেণি থেকে ভিন্ন হলেও বেগারশ্রেণিকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বিষয়ে একই মানসিকতা প্রকাশ করে।

পাঁচ

ঔপন্যাসিক অজয় ভট্টাচার্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যপ্ত মহামন্দা ও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের অমোচনীয় সংকট বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন এ মহামন্দার হাত ধরেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সারা পৃথিবীর স্বাধীনদেশ ও উপনিবেশগুলো দখল ও পাল্টা দখলের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) লিপ্ত হয় এবং ভারতবর্ষেও এর আর্থ-সামাজিক অভিঘাত তীব্র রূপ লাভ করে। সামন্ততান্তিক জমিদারশাসিত সমাজে নানকার প্রজারা চরম অবহেলিত ও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো। উচ্চবিত্ত জমিদার এবং উদীয়মান মধ্যবিত্তের শ্রেণি তাদের অপরিসীম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে এমনকি তাদের স্পর্শও তারা অমঙ্গল হিসেবে বিবেচনা করেছে। শ্রমজীবী ও নিম্নবর্গের কৃষক প্রজাদের দেখলেও তাদের অমঙ্গল বা অকল্যাণ হয় বলে মনে করেছে অথচ এদের শ্রমেই বেঁচে থাকে শোষকশ্রেণি। তৎকালীন সামন্ত সমাজের জাতভেদ প্রথা সম্বন্ধে অজয় ভট্টাচার্য বলেছেন :

> তাদের স্পর্শে বড়-বাড়ির পেতলের ঘটিতে তোলা জল যেমন দূষিত হয়ে যায় তেমনি তাদের হাতে ঠেকলে জগৎবাবুর ডাবা হুঁকার জলও আর ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। সৌদিমিনী ঠাকরুণ ঘাটে গেলে ত আর কথাই নেই; ঘাটের ওপর ছোট জাতের ছায়া পড়লেও কাঁখের কলসী তিনি মাঝ পথেই ঢেলে ফেলেন। বাতাসীর মা ভাবে, বড়তে আর আধা-বড়তে তবে তফাত কী? একই মুদ্রার তারা ত এপিট ওপিঠ।[২১]

বেগাররা হিন্দু কিংবা মুসলিম ধর্মের নিম্নবর্গের মানুষ। তাদের পেশাই তাদের নিম্ন সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ফলে চাকরিনির্ভর মধ্যবিত্তের সুপ্ত বাসনা হারানো তালুক কিনে ক্ষুদ্র জমিদার হওয়া। চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের উন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জন্য ইংরেজের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পুত্রের জন্য সুভাষের মা ইংরেজি জানা পাত্রী সন্ধান করে। ক্ষুদ্র জমিদারি প্রথার এ সমাজে মাত্র কয়েকশত টাকা হলে নিলামি তালুক ফেরত পাওয়া যায়।

বসন্তপুর গ্রামের প্রজারা সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলেও সামন্ত লাম্পট্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। জমিদার এমনকি জমিদারের সমর্থনপুষ্ট পেয়াদা, ভৃত্যরা পর্যন্ত লাম্পট্যে লিপ্ত হয়েছে। ছোটবাবু চরিত্র এ উপন্যাসে লাম্পট্যের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে আর তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেছে তার ভৃত্য ঝট্‌কা। সামন্ত প্রভুগণ সুন্দরী অল্পবয়সী নানকার প্রজার স্ত্রী-কন্যাদের ভোগের সামগ্রী করতে চায়। সেজন্যই এ উপন্যাসে দেখা যায়, এক সময়ের সুন্দরী নারীদের রেখে ছোটবাবুর নতুন আকর্ষণ তৈরি হয় কিশোরী পুটির প্রতি। পুটির বাবাকে হুকুম করার জন্য ঝট্‌কাকে পুটির বাড়িতে পাঠিয়েছে ছোটবাবু। তবে লাম্পট্য আশ্রিত এ সমাজের ঝটকার মতো চরিত্রভ্রষ্ট বেগাররা বাতাসীর মার ন্যায় বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী নারীকে ভয় পায়।

এক সময় বহু যুগ ধরে চলে আসা সামন্ত শোষণনির্ভর বসন্তপুরের সমাজেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। এ পরিবর্তনের কারণ সামন্ত প্রভুদের শাসন-শোষণ এবং অকারণে নানা নির্যাতন। শোষিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত মানুষ আর সামন্তপ্রভুদের কদর্যতার ভার বইতে পারে না। অন্যদিকে এ পরিবর্তনের পেছনে বাহ্যিক কারণ হিসেবে সক্রিয় থাকে দুলাল, রমন, রসিক, রফিক, জব্বারের মতো বাস্তুচ্যুত প্রতিবাদী মানুষের সক্রিয় জীবনবোধ। যা ক্রমে সঞ্চারিত হয় বসন্তপুরের প্রজাদের মধ্যে। শোষিত মানুষেরা ক্রমেই একত্র হয়ে সামন্ত শাসনের অবসানকল্পে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে

এবং শোষণহীন একটি নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছে। কার্ল মার্কসের ভাষায় : 'Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary transformation... in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat.'[২২] সমাজে দুটি শক্তির মধ্যেকার সামাজিক লড়াই ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় লাঞ্ছিত কিশোরী পুটি ঝট্‌কার দিকে ঝাড়ু নিক্ষেপ করে এবং এ ঝাড়ু সামন্ত সমাজের প্রভুদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয় শ্রমজীবী মানুষের অত্মজাগরণের শক্তি হিসেবে। বড়বাড়ির সামন্তপ্রভুরা এ ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। বসন্তপুর গ্রামে সর্বহারা মানুষের এ পরিবর্তনকে ঔপন্যাসিক প্রকৃতির অনুষঙ্গে বর্ণনা করেছেন 'সবার অগোচরে বসন্তপুরে তাই হাওয়া বদলায়। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে না এলেও শীতের হাওয়া কেটে গিয়ে বসন্তের বায়ু সঞ্চালনে বসন্তপুরের কচি কুঁড়িটিও নড়ে নড়ে উঠছে, তা আর প্রচ্ছন্ন থাকে না।'[২৩] পুটির দ্বারা ঝট্‌কার প্রহৃত হওয়া বড়বাড়ির বাবুদের সামন্ত অহমিকায় আঘাত করে। তারা ঝট্‌কার কৃতকর্মের মধ্যে কোনো দোষ খুঁজে পায় না বরং চিরন্তন অহমিকায় তারা উত্তেজিত হয়ে ভংগুকে কান ধরে আনতে, ভংগুর বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে আর ভংগুর মেয়েকে লুট করে আনতে আদেশ দেয়। ছোটবাবু ঝট্‌কাকে ভংগুর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে বলেছে। কিন্তু ভৃত্যরা প্রভুর আদেশ আর পূর্বের ন্যায় পালন করতে সাহস পায় না, তারা একে অন্যের অনুসন্ধানে নানা দিকে সরে পড়ে।

সামন্তপ্রভুরা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে হুকুম পালনকারী চোর-ডাকাত পালন করে, তাদের আশ্রয় দেয়। এসব চোর-ডাকাতের বিরুদ্ধে জনরোষ তীব্র হলে তাদের নাট-মন্দিরে ঠাঁই দেন। নানকার বেগারদের চোখে ধর্মের আবরণ পরিয়ে নিজের প্রভুত্ব রক্ষা করেছে তারা। চোরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে দরিদ্র নানকার প্রজারা, চোর ধরা পড়লে তাকে শাসনের ক্ষমতা জমিদারের হাতে। তাই গ্রামে বিচার ক্ষমতার মালিকও সামন্তপ্রভুরা। নিজেদের ইচ্ছেমতো বিচারের রায় প্রদান করেন বড়বাবু। তাদের বিচার ব্যবস্থা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে অজয় ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন: 'শাসন বড় বাবুই করবেন, তিনি এ গ্রামের মালিক। এ গ্রামের আইন, আদালত, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট তারই হাতের আঙ্গুলে বাঁধা। তাকে ডিঙিয়ে আর কারো এ গ্রামে বিচারের অধিকার নেই। এ এখানকার চিরদিনের রীতি।'[২৪]

ছয়

বাল্যবিয়ে প্রচলিত সমাজে বাতাসীর মার সমগোত্রীয় প্রতিবেশীরা নবীন যুবক বীরুকে বিয়ে দেবার বায়না ধরে। কিন্তু ভিন্ন ভাবনায় মগ্ন বাতাসীর মা পুত্রের বিয়ের কার্যকর উদ্যোগ নেয় না। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে চৈত্র মাস অশুভ তাই এ সময়ে বিয়েশাদি চলে না। বৈশাখ মাসে বেগাররা ধান লাগানোর জন্য মাঠের কাজে লিপ্ত হয়। একমুঠো ভাতের আশায় শীর্ণ গরুগুলোকে নিয়ে তারা বেগারির বিনিময়ে প্রাপ্ত সামান্য দু'এক বিঘা জমিতে চাষের কাজে লাগে। বন্যা কিংবা খরা না হলে ফসল ভালো হয় এবং কিছুদিনের জন্য তারা অভুক্ত থাকার হাত থেকে রক্ষা পায়। যদিও জমির স্বল্পতা আর জমিদারি শোষণের কবলে বাঁচার পথ তাদের চিরকালই সংকীর্ণ থাকে। সামন্ত সমাজে বিভিন্ন সময়ে জমিদারেরা একে অপরের সঙ্গে দাঙ্গায় জড়িয়ে যায় আর তখন ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও

নানকার ও বেগার প্রজারা নিজেদের জমিদারের পক্ষাবলম্বন করে অন্য জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে জীবন দিতে বাধ্য হয়। যদিও দাঙ্গায় তাদের কোনো স্বার্থ থাকে না কিন্তু তাদের কপালে জোটে শুধু রক্ত আর মৃত্যু। আহত বেগারের চিকিৎসায় জমিদারের ডাকে আসে গ্রাম্য-ডাক্তার। বাতাসীর মা জানতে পারে পুত্র বীরুর মৃত্যুর খবর। নিহত পুত্রের মুখদর্শনে জমিদার বাবুরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। নিহত পুত্রের লাশ দর্শনে বাতাসীর মা সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বাতাসীর মা তার একমাত্র পুত্রকে বড়বাড়ির চক্রান্তে হারিয়ে ফেলেছে। সামন্তপ্রভুদের শাসন-শোষণের এ কদর্য রূপকে অজয় ভট্টাচার্য এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন এভাবে: 'জন কোলাহল শান্ত হল। রক্ত দিয়ে রক্ত নিয়ে রক্তে গাঁথা বিজয়-মাল্য বড় বাড়ির কণ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। ফিরল না কেবল বাতাসীর মা। ফিরতে পারল না বাতাসীর মার ছেলে বীরু।'[২৫]

বীরুর মৃত্যু বসন্তপুরের সামন্তপ্রভুদের জন্য অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। তারা বীরুর মৃত্যুর ঘটনাকে পুঁজি করে প্রতিপক্ষের জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার বাড়ির জমিদারকে নাস্তানাবুদ করার এমন চমৎকার সুযোগ তারা কোনোক্রমেই হাতছাড়া করতে চায় না। সেজন্য বীরুর লাশ তাদের কাছে 'বিজয়লক্ষ্মী' হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই লাশ সঙ্গে করে বড় বাবু সদরের পথে রওনা দেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় বাতাসীর মা। বড়বাড়ি আর সরকার বাড়ির বিরোধ বসন্তপুরের বেগারদের দৃষ্টিসীমার বাইরে শহরে স্থান করে নেয়। বীরুর মৃত্যুর পর, বাতাসীর মার নিরুদ্দেশ অবস্থানে বসন্তপুরের সামন্তসমাজ যেন নবজীবন লাভ করে। কিন্তু *বাতাসীর মা* একদিন সন্ধ্যায় তার ভিটায় ফিরে আসে এবং আঁধার রাতে বড়বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা শ্রেণি ঘৃণার অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দেওয়ার বাস্তব প্রচেষ্টা চালায়। এ আগুনে বড়বাড়ি ধ্বংস না হলেও, তাদের গোয়ালঘর পুড়ে যায় এবং বাতাসীর মা নিজে আগুনে পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হয়। হিন্দু বাড়িতে আগুনে পুড়ে গরুর মৃত্যুকে বিশেষ অমঙ্গলের অশনি সংকেত হিসেবে মনে করা হয়। বড়বাবু এ ঘটনায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পুরো গ্রামকে পুড়িয়ে মারার হুমকি প্রদান করে। বাতাসীর মার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বসন্তপুরের বেগার শ্রেণি অসহায়ত্ব অনুধাবন করতে পারে এবং বেগার প্রজারা সামন্ত জমিদারের বিরুদ্ধে মরণপণ সংঘর্ষ ও শ্রেণিদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। *বাতাসীর মা* উপন্যাসে পরিণতি পর্বে সর্বহারাশ্রেণির সঙ্গে সামন্তশ্রেণির নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণিসংগ্রাম বাস্তবরূপ লাভ করে। কারণ মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, 'মানুষের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নিজের সীমাবদ্ধ খণ্ডিত জীবনকে ছাড়িয়ে বিপুল বিশ্বে প্রসারিত করার এবং বৃহৎ মানব সমুদ্রে অবগাহন করার।'[২৬] তাই বাতাসীর মা নিজের খণ্ডিত জীবনের বিনিময়ে সমস্ত গ্রামের মানুষের মধ্যে মুক্তি ও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে।

প্রচলিত অর্থে *বাতাসীর মা* কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, এমনকি রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক কোনো তৎপরতা এ উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মার্কসবাদ মতে রাজনীতি কোনো নিরপেক্ষ ক্ষেত্র নয়; বরং এটি সমাজের শ্রেণি-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও আধিপত্য অর্জনের লড়াইয়ের প্রতিফলন। প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচি বা মতাদর্শ আসলে কোনো না কোনো শ্রেণির অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে। কার্ল মার্কসের ভাষায়, 'The executive of the modern

state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.'[২৭] রাষ্ট্র কোনো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান নয়, এটি শাসক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী একটি উপকরণ। রাষ্ট্রের নীতি, আইন, প্রশাসনিক কাঠামো সবই বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে তৈরি। এ উপন্যাসে বেগারি শৃঙ্খল ভাঙার যে সংগঠিত প্রয়াস তা রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ বলে বিবেচনা করা যায়।

ফকির বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), গারো বিদ্রোহ (১৮২২), কিংবা সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) মতো নানকার বিদ্রোহও (১৯৪৭-১৯৪৮) ছিল শোষণ মুক্তির রক্তাক্ত লড়াই। সে বিবেচনায় অজয় ভট্টাচার্যের *বাতাসীর মা* শোষণমুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রাম তথা শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতি নির্ভর উপন্যাস। সর্বহারা শ্রেণির এই সংগ্রাম প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন: 'The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working Men of All Countries, Unite!' [২৮] এটি মার্কসবাদী আন্দোলনের মূল আহ্বান। শ্রেণি চেতনা (class consciousness) জাগ্রত না হলে শ্রমিক শ্রেণি তাদের শোষণ উপলব্ধি করতে পারে না। ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবই পারে সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করতে। তাই *বাতাসীর মা* উপন্যাসে অজয় ভট্টাচার্য বাস্তবসম্মতভাবে শ্রেণি সংগ্রামের দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করেছেন। দুলালের ব্যক্তিগত বিদ্রোহকে বাতাসীর মা সামষ্টিক বিদ্রোহে রূপ দিতে প্রয়াস পায়। কিশোরী পুটি বড় গিন্নির আদেশে ঝট্কার দ্বারা লাঞ্ছিত হলে সে অন্য বেগার নারীদেরকে বলেছে 'চল পুটি, জানোয়ারের রাজ্যে এক মুহূর্তও আর থাকব না, সবকটি এখানে জানোয়ার।' এরপর বড়বাড়ির বড় গিন্নির আদেশকে সে স্পর্ধিতভাবে উপেক্ষা করে চলে এসেছে বড়বাড়ির থেকে। বাতাসীর মার এই প্রতিবাদী চেতনা অন্যান্য লাঞ্ছিত বেগারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই বেগার নারী যমুনা ঘোষণা করেছে :

> 'বিচার নেই আচার নেই, গায়ের জোরে সব চলবে– সেদিন ফুরিয়ে গেছে। বসন্তপুর আর সে বসন্তপুর নেই।' অন্যরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলতে থাকে : 'এমন মুখ বুঁজে বসে থাকলে আর চলবে না, বারবার যা এখনই করতে হবে'।[২৯]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের রাজনৈতিক অভিঘাতের ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সর্বহারা শ্রেণির মানুষেরা আশা করে রাজনৈতিক ঐ পরিবর্তনে সামন্তশ্রেণির শাসনের অবসান হবে। মুক্তি পাবে বেগার সমাজের মানুষেরা, শোষণমুক্তির এ সুর ক্রমান্বয়ে প্রবল হতে শুরু করে। বাতাসীর মার কল্পনায় প্রকাশিত হয় সামন্তশ্রেণির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা, এমনকি জিঘাংসা তার মনোভূমিকে গ্রাস করে। উল্লেখ্য, সামন্তশ্রেণির প্রতি বাতাসীর মার এ ঘৃণা নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের শ্রেণিঘৃণার অনুরূপ। কমরেড চারু মজুমদার (১৯১৮-১৯৭২) প্রদর্শিত নকশালপন্থি সংগঠন হিসেবে পরিচিত ইপিসিপি (এমএল.)-এর কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। আর হয়তো এ কারণেই লক্ষ করা যায়, বাতাসীর মা কল্পনার মাধ্যমে হাজির হয় বড়বাড়িতে এবং তীব্র ঘৃণায় সে বড়বাড়ির বাবু ও গিন্নিদের হত্যা করে। বাতাসীর মার এ কাজে তাকে সাহায্য করে পুটি, রঙমতী প্রভৃতি বেগার নারীরা। প্রকৃতপক্ষে বাতাসীর মা, পুটি, রঙমতী প্রমুখ প্রতিশোধপরায়ণ বেগারের স্বপ্ন, কল্পনার মধ্যে ভাষারূপ পেয়েছে ঔপন্যাসিক অজয় ভট্টাচার্যের স্বপ্নের রাজনীতি। কল্পনায় বাতাসীর মা আর রঙমতীর সংলাপের

মাধ্যমে যা উপস্থাপিত হয়েছে। তাই মানুষ তাকে ছেলের বিয়ের কথা বললেও সে ভাবে অন্য কথা। সে বড়বাড়ির বিরুদ্ধে আপোশ করে চলতে গিয়ে সমস্ত হারিয়ে তার মনে বড়বাড়ির বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিশোধ গ্রহণের কথাই চিন্তা করেছে। কল্পনায় সে বড়বাড়ির সবাইকে গলা টিপে হত্যা করেছে। তার এ মনোভাবকে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> যতই দিন যাচ্ছে, যতই তার বয়স বাড়ছে ততই যেন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ভাবনার রথ এখন বেপরোয়া ছাড়ে। জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে ভাবনার তরী নিয়ে সে ছোটে, অবরোধ প্রতিরোধ কিছুই হিসেব করে না। কল্পনার পথ ধরে সে বড় বাড়ি চলে যায়। তারপর গলা টিপে টিপে বাবুদের গিন্নীদের সে মারে।[৩০]

নানকার প্রজা আজীবন জমিদারের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত থাকে। তবে উপন্যাসে কাহিনিতে জটিলতা সৃষ্টি হয় যখন বাতাসীর মা স্বামী, কন্যা, হারিয়ে নিজে বড়বাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং গ্রামের নানকার বেগাররা নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা আদায়ে বড়বাড়ির সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সংকল্প গ্রহণ করে; কিন্তু তাদের এই প্রতিবাদী চেতনা সহজেই তারা প্রকাশ করতে পারে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশে তারা নুইয়ে পড়ে। কিন্তু বাতাসীর মা পরিবারের সকলকে হারিয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে বড়বাড়ির শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং তার এ প্রতিবাদী চেতনা পরবর্তীতে গ্রামের সমস্ত মানুষের বিশেষত নানকার সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

সাত

সুনিদিষ্টভাবে দেশ-কালের কাঠামোতে *বাতাসীর মা* উপন্যাসের কাহিনি সীমাবদ্ধ নয়। তবে উপন্যাসে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এর স্থান ও কালগত পরিচিতি বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। উল্লেখ্য যে, নানকার বিদ্রোহের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নানকারদের ব্যক্তিগত বিদ্রোহগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সামাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সংগঠিত রূপ পেতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় চিরলাঞ্ছিত নানকাররা সংগঠিত করে 'সুখাইড় বিদ্রোহ' (১৯২২-১৯২৩)। অজয় ভট্টাচার্য রচিত *বাতাসীর মা* উপন্যাসে মূলত এই বিদ্রোহের সাহিত্যিকরূপই চিত্রায়িত হয়েছে। ফলে সুখাইয়ের বিদ্রোহের স্থান-কালগত প্রেক্ষাপট থেকে *বাতাসীর মা* উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশ-কাল-সময় সম্পর্কিত ধারণা পেতে পারি। যদিও ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে সচেতনভাবে সামন্তলাম্পট্য ও শোষণবিরোধী সংগ্রামকে দেশ-কাল-সীমানার কাঠামোমুক্ত চিরন্তন রূপদানের প্রয়াস পেয়েছেন।

অজয় ভট্টাচার্য 'সুখাইড় বিদ্রোহ' যে প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, জমিদার যখন খুশি নানকার নারীদের ঘর থেকে ডেকে এনে তার নিজের লাম্পট্য চরিতার্থ করে। জমিদার যা করে তার ছেলেও তাই করে, এমনকি জমিদারের আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগতরা এলেও নানকার নারীদেরই তাদের লাম্পট্যের খোরাক হতে হয়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। জমিদারিপ্রথার অনুষঙ্গী এই ব্যবস্থাটা গ্রামের মানুষকে বিনা প্রতিবাদে মানতে হয়। গ্রামের সাধারণ লোক এই বর্বর ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। কিন্তু এই ঘৃণার প্রকাশ নেই দেখে জমিদার নির্ভাবনায় দিন অতিবাহিত করে। জমিদারি ব্যবস্থা ও তার অনুষঙ্গী এই লাম্পট্য চিরদিন টিকে থাকবে বলে জমিদার পরিবারের সবাই মনে করে। কিন্তু অবস্থা চিরদিন একই রকম থাকে না।

গ্রামের এক নানকার নারী জমিদারের লাম্পট্যপ্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে বরং জমিদারের লোককে কটু কথা বলে যা শুনে জমিদার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। জমিদারের পেয়াদারা নারীকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং এতে গ্রামের লোক ক্ষুদ্ধ হয়ে জমিদার বাড়ি থেকে সেই নারীকে উদ্ধার করে আনে। এ বিদ্রোহের স্থানগত পরিচয় সম্বন্ধে অজয় ভট্টাচার্য বলেন :

> সুখাইড় গ্রাম সিলেট জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে সুনামগঞ্জ মুহকুমার ধর্মপাশা থানায়। উত্তরে খাসিয়া পাহাড়, পূর্বে ও দক্ষিণে বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চল এবং পশ্চিমে এককালের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মুহকুমা, অধুনা জেলা, সীমানা হয়ে আছে। ... একান্তভাবে সুখাইড় গ্রামের নানকার প্রজাদের প্রচেষ্টায় তাদেরই আত্মীয়তার সূত্র ধরে এই বিদ্রোহ সুনামগঞ্জ মহকুমার গৌররঙ্গ ও সিলেট সদর মহকুমার বোয়ালজুর গ্রাম দু'টিতে ছড়াল।[৩১]

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, *বাতাসীর মা* উপন্যাসটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে সিলেট জেলার ক্ষুদ্র সামন্তপীড়িত সমাজ ও ভৌগোলিক কাঠামোকে ধারণ করে রচিত হয়েছে।

অজয় ভট্টাচার্য নানকার বিদ্রোহের প্রধান নেতা হয়েও ইতিহাস রচয়িতার ন্যায় সমস্ত ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন নিরাসক্ত শৈল্পিক দৃষ্টিতে। বাতাসীর মার সংগ্রামশীল জীবনচিত্র উপস্থাপনে তিনি সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন। বড়বাড়ির দ্বারা অত্যাচারিত, সর্বস্বান্ত বাতাসীর মা বড়বাড়ি ত্যাগ করতে চাইলেও ত্যাগ করতে পারে না। জীবনের প্রয়োজনে তাকে সেখানেই বারবার ফিরে যেতে হয় বা কখনো যেতে বাধ্য করে। স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তীতে সে দুটি সন্তানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। তার রিক্ত-নিঃস্ব জীবন সংসার সম্বন্ধে অজয় ভট্টাচার্য সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন :

> বীরুকে বছর খানেকের রেখে বীরুর বাপ যখন মরে গেল বাতাসীর মা তখন আকূল সাগরে ভাসল। কিন্তু সাগরে পড়েও সে হাল ছাড়ল না, দুই হাতের মুঠোয় হাল ধরে সে অতিসন্তর্পনে পথ কেটে চলল। পুরুষের চেয়েও শক্ত থেকে শিশু দু'টিকে বুকে চেপে বাতাসীর মা সেদিন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে রইল।[৩২]

আট

অজয় ভট্টাচার্যের *বাতাসীর মা* উপন্যাসে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোষণ ও নিপীড়নের চিত্র কেবল সরল বাস্তবতার প্রতিবেদন নয় বরং এগুলো প্রতীকী বর্ণনা, আবেগময় চিত্রায়ণ ও কল্পনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একটি বার্তা দিয়েছেন এবং অনুষঙ্গ হিসেবে লাল কৃষ্ণচূড়ার ব্যবহার করছেন। কৃষ্ণচূড়া গাছ ও তার লাল-রক্তিম ফুল উপন্যাসে প্রতীকী অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অজয় ভট্টাচার্য লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর বিপ্লবী রাজনৈতিক অনিবার্যতা, যা *বাতাসীর মা* উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

> বাতাসীর মার ঘরখানা শূন্য, একেবারেই শূন্য। শূন্য এ ঘরখানা কেবল দাঁড়িয়েই থাকে। দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার গাছও। ডাক্তার দেখেন গাছটার এখানে-ওখানে যেন বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। কিন্তু ফুলের বাহারে তারতম্য নেই। আগুন রঙের ফুল, আগে যেমন খেলত, আজো ঠিক তেমনি কৃষ্ণচূড়ার শাখে শাখে যেন আগুন নিয়েই খেলে। কিন্তু বাতাসীর মার আঙ্গিনাটা ঝরা ফুল আর ঝরাপাতায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।[৩৩]

কৃষ্ণচূড়া গাছে বার্ধক্যের ছাপ পরিলক্ষিত হলেও ফুলগুলো লাল আগুনের প্রতীক হয়ে গাছের ডালে দুলতে থাকে। আন্দোলন সংগ্রামে অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েন কিন্তু বিপ্লব সর্বদা চলতেই থাকে, বিপ্লবের লাল আগুন প্রজ্বলিত। আলোচ্য উপন্যাসের পরিণতিপর্বে বাতাসির মা ডাক্তার বঙ্কিমবাবুর নিকট আগুন প্রার্থনা করেছে। সে শাসন-শোষণ নির্যাতনের প্রতিবাদী হয়ে বড়বাড়ির গোয়ালঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং নিজেও সে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল এ উপন্যাসে বিপ্লব হিসেবে চিত্রিত।

একজন মার্কসবাদী সাহিত্যিক হিসেবে তিনি অবগত ছিলেন যে, সমাজ ও সমাজ বিকাশের ধারা সরলরৈখিক নয়, সর্পিল। নদীর স্রোতের মতো তা সম্মুখ প্রসারী হলেও, স্রোতধারার চলমান গতি সরল নয়, বক্র। শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক মুক্তি ইতিহাসের অনিবার্য গতিধারা। এ গতিধারায় বিবর্তনের দীর্ঘপথে পাড়ি না দিয়ে বিপ্লবের পথে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক মুক্তি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এই মুক্তির লক্ষ্যে শ্রেণিসংগ্রাম ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতা। শোষিত মানুষেরা নিজেদের নির্মম পরিণতির জন্য সামন্তশ্রেণির শাসকদের দায়ী করে শ্রেণিসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তাই দেখা যায় আলোচ্য উপন্যাসে বাতাসীর মা জ্বালাময়ী চোখের দৃষ্টি নিয়ে বড় বাড়ির পতন কামনা করেছে। ঔপন্যাসিক বাতাসীর মার এ প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> তীব্র তীক্ষ্ম জ্বালাময়ী এ দৃষ্টি মেলে সে একবার সম্মুখে তাকাল। বাতাসীর মার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সম্মুখে দেখা যায়, দূরে বড় বাড়ির সাদা সাদা ঘরগুলো লোহিত মেঘের আভায় কেমন রক্তিম হয়ে উঠেছে। বাতাসীর মার দৃষ্টি বুঝি ওখানে গিয়েই ঠেকল।[৩৪]

উপসংহার

অজয় ভট্টাচার্য তাঁর *বাতাসীর মা* উপন্যাসে নিজস্ব বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীশ্রেণির মানুষের নিষ্ঠুরতাকে উন্মোচন করে তাদের পরাজয়ের অনিবার্যতা চিত্রিত করেছেন। বুর্জোয়া মধ্যবিত্তশ্রেণি নয়, বরং সর্বহারা শ্রেণিদৃষ্টি *বাতাসীর মা* উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিবাচক দিক প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক; আগ্রাসী শোষকের অত্যাচারের স্বরূপ এবং জনগণের ওপর এর প্রভাব উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। ফলে বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসেবে বিবেচিত অজয় ভট্টাচার্যের সাহিত্য উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে বেগারশ্রমে জর্জরিত নানকার প্রজাসদৃশ মানুষের সমাজপ্রগতিতে দ্বিধাহীন বিশ্বাস রূপ লাভ করেছে। শ্রেণিবিভক্ত নানকার অধ্যুষিত সামন্তসমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যেকার নিজস্ব স্বার্থগত সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক ভাষ্যরূপ পেয়েছে *বাতাসীর মা* উপন্যাসে। অজয় ভট্টাচার্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে মানবীয় সমগ্রতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ Karl Marx and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*. Moscow: (Tr) Progress Publishers, 1977, p. 49

২ Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Moscow: (Tr) Progress Publishers, 1977, Preface, p. 20

৩ Karl Marx and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*, Moscow: Progress Publishers, 1977, pp. 49–50

৪ হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬

৫ সাঈদ-উর রহমান, *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৬

৬ ওবায়দুল্লাহ সাগর, *নানাকার বিদ্রোহের নায়ক অজয় ভট্টাচার্য জীবন ও সাহিত্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ১০১

৭ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪

৮ রফিকউল্লাহ খান, *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৩

৯ Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers, 1977, Preface, p. 20. (English edition).

১০ বদিউর রহমান, *উপন্যাসের যত বিষয়* (মূল : ই এম ফরস্টার), পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩১

১১ ওবায়দুল্লাহ সাগর, *নানাকার বিদ্রোহের নায়ক অজয় ভট্টাচার্য জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩

১২ অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫

১৩ অজয় ভট্টাচার্য, *বাতাসীর মা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০

১৪ সাঈদ-উর রহমান, *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৫ অজয় ভট্টাচার্য, *বাতাসীর মা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৭ সিরাজ সালেকীন, *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৩

১৮ অজয় ভট্টাচার্য, *বাতাসীর মা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

২২ Karl Marx, *Critique of the Gotha Programme*. In *Marx/Engels Selected Works*, Vol. 3, Moscow: Progress Publishers (1875), pp. 21–22

২৩ অজয় ভট্টাচার্য, *বাতাসীর মা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২৬ সাঈদ-উর রহমান, *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২৭ Karl Marx and Friedrich Engels. *The Communist Manifesto*, Ibid, p. 49

২৮ Ibid, p. 116.

২৯ অজয় ভট্টাচার্য, *বাতাসীর মা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৩১ অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬
৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮